আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও মহাশ্বেতা দেবীর কথোপকথন

‘শব্দ তো আঘাত করে। শব্দ তো ভদ্রলোকের সব সভ্যতা ভেঙে দেয়...’

কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং কথাশিল্পী মহাশ্বেতা দেবীর এই কথোপকথনের দুই পর্ব এর আগে সর্বজনকথার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই আলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ইলিয়াসের বাসায় যখন তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে কঠিন সময় পার করছেন। মহাশ্বেতা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। বেশ কয়েকদিন মহাশ্বেতা ইলিয়াসের বাসায় আসেন, দীর্ঘসময় কথা বলেন, গান করেন। এক পর্যায়ে ইলিয়াস মহাশ্বেতা দেবীর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার নেবার আয়োজন করেন। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৬, ইলিয়াসের আজিমপুরের বাসভবনে এই আড্ডা হয়। আরও উপস্থিত ছিলেন বদরুদ্দীন উমর, কাজী ইকবাল এবং মুফাদ চৌধুরী। এর কিছুদিন পরই, ১৯৯৭ সালের ৪ জানুয়ারি ভোরে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। মহাশ্বেতা দেবী মারা গেছেন ২৮ জুলাই ২০১৬। রেকর্ডকৃত এই কথোপকথন থেকে অনুলিখন করেছেন তাসলিমা আখতার।

মহাশ্বেতা দেবী: মঙ্গল সরেন নামে একজন অত্যন্ত সুপণ্ডিত সাঁওতাল, কংগ্রেসের সময় এমএলএ হয়েছিল, একবারই হয়েছিল, তারপর সবটাই জোচ্চুর বলে ফেলে দিয়ে চলে এসেছিল। বাবা মারা যাবার পর আমি ঝাড়গ্রামে গেছি। সেই লোকটা এলো পাহাড়ি গ্রাম থেকে। তার হাতে একটা বাটালি আর একটা ছুরি। ও কোদালের বাট তৈরি করছিল, ও বলল–মা, তুই এসেছিস, তাই আমি চলে এসেছি। বলল, মুখখানা মলিন কেন? আমি বললাম যে, বাবা মারা গেছেন। বলল–না, তোর তো বাবা মারা যেতে পারে না। আজ থেকে আমি তোর বাবা। উনি চিরকাল ‘তোমার পিতা’–এই নামে আমাকে চিঠি লিখতেন। এই লোকটা সাঁওতালি ভাষার আদি জানতে নদীর উৎসে গিয়েছিল। এই লোকটা সংস্কৃত ভাষার বিভিন্ন Stage-এ যে বলা হতো, তার সঙ্গে পরিচিত ছিল, সুনীতি বাবু একে ডেকে Consult করত। প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত–সব জানতেন। মঙ্গল বাবুর নায়েকে পূজা দিতে ৩০ হাজার আদিবাসী সাঁওতাল মুণ্ডা...যারা পুলিশ হয়েছে, আশপাশ থেকেও সব এসেছে, আমি যাব শুনে। তখন পুলিশ কমিশনার বলল, দেখছেন তো আমরা Tribe-দের জন্য কত কিছু করে দিচ্ছি, অমুক করছি। আমি বললাম, আপনারা কিছুই করেননি, ওরা নিজেরাই...সেভাবেই এসেছে, আর এরা তো সবাই পুলিশ নয়, রেলওয়ের কর্মীও অনেক আছে। যা-ই হোক, যেটা দেখার সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। ৩০ হাজার লোক বসে আছে, একজন কারো হাত-পা নড়ছে না। তারা নীরস বক্তৃতাই শুনছে। নীরবে শুনছে শিশুরাও, এই যে অদ্ভুত ভেতরের ডিসিপ্লিন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: শৃঙ্খলাটা সাংঘাতিক। চাকমাদের মধ্যেও সাংঘাতিকভাবে আছে discipline...

বদরুদ্দীন উমর: সে ঐ যে আমেরিকায় যে বঙ্গ সম্মেলন হলো, সেখানে সম্মেলন চলছে বুঝেছেন, তার মধ্যে ভীষণ কথাবার্তা, আমি সব লোককে জিজ্ঞাসা করলাম যে এরা কথাবার্তা বলার জন্য ভেতরে ঢুকেছে কেন? বাইরে তো আছে।

আ. ই. : (হাসি) বাইরে তো স্পেস অনেক।

ব. উ. : আপনি কি মনে করেন এই ট্রাইব কিংবা আদিবাসী–যেভাবে বলেন, তাদের মধ্যে কোনো শ্রেণিচেতনা আছে?

ম. দে. : পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক প্রচার যথেষ্ট হওয়ার ফলে তারা সব সময় যখন চিঠি লেখে, লেখে ‘তাহলে ভাবিয়া দেখুন বুর্জোয়া শ্রেণি কে?’ এই কথা প্রায়ই লেখে। লেখে ‘বুর্জোয়া কাহারা?’ Point সেটা নয়, Tribal as a whole কিছু কিছু Exception তো নিশ্চয় আছে। সেটাই তো আমি চোট্টি মুণ্ডায় লিখেছিলাম। যারা নন ট্রাইবাল, তাদের Exploited যারা, তাদের সঙ্গে এক জায়গাতেই পড়ে, তাদের কোনো জাতিবিভেদ নেই। আর আমার অন্যান্য লেখাতেও তো আমি শোষক আর শোষিত–এই বিভাজনটা পরিষ্কার রেখেছি।

ব. উ. : লেনিন যেমন ‘গ্রামের গরিবদের প্রতি’ লেখার সময় বুর্জোয়া কথাটা ব্যবহার করে তাদেরকে বোঝানোর জন্য তলাতে লিখেছেন যে বুর্জোয়া মানে হচ্ছে ধনী লোক।

ইকবাল: ওরা কিভাবে চিহ্নিত করেছিল?

আ. ই. : হ্যাঁ, ওরা কিভাবে চিহ্নিত করে?

ম. দে. : ওরা নিজেরা পরিষ্কার বোঝে, বলে এরা আমাদের ভাঙিয়ে বড়লোক হয়েছে। এরা, ধনীরা, চিরকাল আমাদের এই করেছে, আমাদের এই অবস্থায় ফেলে ওপরে উঠেছে। ওরা শ্রেণিট্রেনি ব্যবহার করে না, কিন্তু ব্যাপারটা ওরা পরিষ্কার বোঝে, এটা সম্পূর্ণ বোঝে...।

ব. উ. : শ্রেণির একটা চেতনা তো ওদেরও আছে?

ম. দে. : পরিষ্কার আছে। শুধু Tribe না, Non-tribe-এরও আছে। ভীষণভাবে আছে। ওরা সবই জানে।

ইকবাল: গ্রামে অনেকে যেমন বড়লোকদের সাহেব বলে। আমাদের এখানেও সাহেব বলে, ঠিক ধনী বলে না। নিজেদের ক্ষেত্রে যখন চিহ্নিত করে ওরাও (Tribe) নিশ্চয়ই ওদের Term-এ কিছু ব্যবহার করে?

ম. দে. : শুধু Tribe নয়, Non-tribe-এও বাবু বলে।

ইকবাল : যারা ধনী হয়ে গেছে, তাদের বাবু বলে।

ম. দে. : যারা ধনী হয়ে গেছে বা পুরুষানুক্রমে ধনী, তাদের বাবু বলে।

ব. উ. : আমি একবার খুলনার আবাদ অঞ্চলে একজন সো কলড লোয়ার ক্লাশ-এর একজনকে বাবু বললাম...

ম. দে. : অপমানিত হলো?

ব. উ. : না, সে বলল, আমাকে বাবু বলবেন না। অপমানিত হলো না। বলল যে, আমাকে বাবু বলবেন না। আমি তো বাবু নই, আমি গরিব মানুষ।

আ. ই. : আচ্ছা একটা ব্যাপার যে, ধরুন কোথাও Tribe আছে, তার পাশে এমনি সাধারণ লোকালয় আছে। Tribal people exploit করা হচ্ছে, আবার পাশে যে বাঙালি চাষি, তাদেরও ঊীঢ়ষড়রঃকরা হচ্ছে। আচ্ছা এদের মধ্যে যারা Exploited tribal people এবং Exploited বাঙালি চাষি, এদের মধ্যে কোনো রকম বিরোধ বা ঐক্য কি আছে?

ম. দে. : না না, কোনো বিরোধ নেই। ওরা যখন কোথাও নামাল

কাটতে যায়, তখন ওরা সবাই একসঙ্গেই যাবে। গভীর ঐক্য...

ইকবাল: বিরোধ নেই বলাটা কি ঠিক? জাতিগতভাবে তো একটা পার্থক্য থাকছে?

ম. দে. : জাতিগতভাবে কী পার্থক্য থাকবে?

ইকবাল: বাঙালি Tribe– এই যে একটা পার্থক্য।

ম. দে.: না না, অত দূর যায়নি, ওসব যায়নি, ওসব নেই। ট্রাইবরা নিজেদের মধ্যে তাদের মতো, নিজেদের মতো করে আছে। কিন্তু যখন তারা ক্ষেতে খাটতে যাচ্ছে, কোথাও কিছু করতে যাচ্ছে, একসঙ্গে ব্রিজ তৈরি করছে, পাথর ভাঙছে, একসঙ্গে কিছু করছে, তারা একসঙ্গেই সমস্ত কিছু করছে। অর্থনীতি এবং ক্ষুধাই নিয়ন্ত্রণ করছে সব। ট্রাইবদের মধ্যে আবার আছে, যারা নানা রকম ধান্দাবাজি করে টাকা-পয়সা করেটরে। তাদের আবার অন্য ট্রাইবরা কোনো রকমভাবেই স্বীকার করে না। সে আমাদের লোক নয়। কোনো ট্রাইবাল যদি মন্ত্রী হয়, যেমন শম্ভু মাণ্ডী হয়েছিল। আমাদের গভর্নমেন্টের অদ্ভুত বুদ্ধি অনুসারে Central Govt. এবং State Govt.– সবগুলোতে একটা Tribal-কে Tribal Minister করে। যদিও Tribal Minister একদম ক্ষমতাহীন। দিল্লির এসটি কমিশনার যেমন ক্ষমতাহীন। তার কারণ হচ্ছে, Tribal-দের জন্য Education, এর জন্য কিছু করতে হলে সেটা Educational Department করবে। Land চলে যাচ্ছে Tribal-এর হাত থেকে। সেটা Land Revenue Department-এর কাছে। Health চলে যাচ্ছে Health Department-এর কাছে। তার হাতে Actually কোনো ক্ষমতা নেই। জিনিসটা হচ্ছে সম্মানার্থে। এই Land Alienation হয়েছে, দেখা যাবে আমি হয়তো চিঠিটা দেব Land Revenueminister-এর কাছে, কিন্তু Copy to the tribal minister, not to the tribal minister with a copy to the land revenue minister.

'তুই মন্ত্রী হয়ে লাভটা কী হলো? তুই তো সেই আছিস, মাঝখানে তুই গাড়ি চেপেছিস।'

আ. ই. : Tribal Minister-এর কোনো ক্ষমতা নেই মনে হচ্ছে।

ব. উ. : কার্বন কপিটা আছে।

আ. ই. : হ্যাঁ, কার্বন কপিটা।

ম. দে. : আরেকটা মুশকিল হচ্ছে, ওরা যখন Minister হয়, ওরা Mainstream-এর সাথে মিশতেও পারে না, ওরা খুব Isolated feel করে, হয় তাদের খুব কপি করে, নয় নিজেদের মতো নিজেরা চুপ করে থাকে। চুপ করে থাকে কিংবা তাদের মতো হয়ে যায়। ফলে সে আবার Return হয়। আর নিজেদের সমাজ থেকে একদম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেউ গর্ব বোধ করে না।

ইকবাল: এটা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এটাকে তারা অন্যরা কিভাবে দেখছে? মানে Tribe-এরই অন্য লোকেরা।

ম. দে. : তারা একেবারেই বিশ্বাস করে না, কেননা তারা প্রথমেই মনে করে, 'তুই মন্ত্রী হয়ে লাভটা কী হলো? তুই তো সেই আছিস, মাঝখানে তুই গাড়ি চেপেছিস।'

আ. ই. : আমাদেরও চাকমা মন্ত্রী থাকত না? তার পরও কিছু করার ছিল না। চাকমা মন্ত্রী, মারমা মন্ত্রী– এদের কিছু করার ছিল না, মাঝখান দিয়ে এরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ম. দে. : ওদের নিজেদের সমাজ থেকে।

আ. ই. : ওদের রাজাকার বলা হয়। আমরা গিয়েছিলাম, শুনেছি। লাভ হয়নি কিছু Except Monetary ইয়ে...

মুফাদ: আচ্ছা দিদি Tribe-এর মধ্যে এমন ধনী লোক কি আছে, যারা Exploit করছে তার Tribe-এর লোকদের?

ম. দে. : খুবই কম। সমস্ত পশ্চিমবঙ্গে খুঁজে বা খনন করলে একজন কি দুজন বের হতে পারে, সে খুব কম। আগে অনেক বেশি ছিল ঐ লুসাই-টুসাই ওই সব জায়গায়। তারা ওপরের Tribe-রা নিচের Tribe-দের Bonded Labour করে। দিন পাল্টে গেছে, অনেক অন্য রকম হয়ে গেছে।

মুফাদ: কৈবর্ত খণ্ড পড়ে যেটা আমার খুব ভালো লাগল, মনে হলো যে খুব কম Information নিয়ে এ সম্পর্কে বোধ হয় সন্ধ্যাকর নন্দীর বাইরে...(আ. ই. : সন্ধ্যাকর নন্দীর Information খুব Reliable না।) হ্যাঁ, Reliable না, কিন্তু নীহাররঞ্জনের বইয়ের মধ্যে খুব কম আছে, কিন্তু সেটা নিয়ে যে আপনি একটা লিখলেন, পড়লে মনে হয় You are transported to that period. খুব কম ছোট বইয়ে কিন্তু এটা খুব চমৎকারভাবে এসছে। এটা বড় একটা বই হলে, একটা আবহাওয়া তৈরি করে নিয়ে আসা হয়তো সহজ ছিল। কিন্তু কম বইয়ের মধ্যে কাজটা দেখা যায়। এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে, সন্ধ্যাকর নন্দী আমাদের পড়া নাই, এখানে যে উপাদান নিয়ে আপনি কাজ করেছেন যে Information-এর ভিত্তিতে, তাতে কতটুকু ইতিহাস আছে?

ম. দে. : সন্ধ্যাকর নন্দীর যতটুকু আছে, সবটুকুই ইতিহাস। তা ছাড়া সব জিনিসটা, এটা খুঁটিয়ে পড়লে তখনকার নগরবিন্যাস কোথায় কী রকম ছিল ইত্যাদি জানা যায়। রামপাল যা করেছিলেন, তাও তো জানা যায়।

আ. ই. : ওই বইয়ে যেটা আমরা বড় পাচ্ছি, এখানে যে কৈবর্ত বিদ্রোহটা হয়েছিল, এখানে যেটা পাচ্ছি কৈবর্তরা দুরকম–জালিক আর হালিক। তো, ওখানে বিদ্রোহ হয়েছিল দিব্যক ও ভিমের নেতৃত্বে। একজন চাচা, অন্যজন ভাইপো। সেই বিদ্রোহ রামপালের বিরুদ্ধে ছিল। রামপাল Government ধরনের ছিল। রামপাল বৌদ্ধ ছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা কিন্তু যখন সে কৈবর্তদের দমন করতে গেল, কৈবর্তরা কিন্তু বৌদ্ধ না, কৈবর্তরা মাছ মারে, কৈবর্তরা কিন্তু রামপালকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কৈবর্তরা শিবকে পূজা করে, মাছ মারে, কেউ চাষ করে–তারা কিন্তু রামপালকে মারল না। মানে মেরে ফেলল না আর কি। রামপালকে ধরে রেখে দিল। রামপাল কিন্তু বৌদ্ধ, এটা মনে রাখতে হবে। রামপাল যখন এদিক-ওদিক করে ছাড়া পেল, পেয়ে সে যে ব্যবহারটা করল কৈবর্তদের সঙ্গে, তাতে বুদ্ধের অহিংসার কিছুই থাকল না।

ম. দে. : এটা একেবারেই শ্রেণিহিংসা।

আ. ই. : একেবারেই শ্রেণিহিংসা। আমরা দেখেছি যে শান্তির ধর্মগুলো, সে যে কোনো ধর্ম হোক, ধর্ম মানেই তো শুনি যে শান্তির ধর্ম। সেগুলো সব সময় কিন্তু সুযোগ পেলেই তলোয়ার ব্যবহার করেছে। অহিংসা ধর্ম প্রচারের জন্য পুণ্ড্রবর্ধনে তিন হাজার জৈন সৈন্য হত্যা করা হয়েছিল। বলেছে, 'অহিংসা মানো?' বলেছে 'মানি না।' সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো, 'মেরে ফেলো।'

ম. দে. : অশোক কী করেছিল?

আ. ই : হ্যাঁ, অশোক কী করেছিল?

মুফাদ : কৈবর্তরা তো ঐ মহিপালকে মেরেছিল।

আ. ই. : ঐ যে যার নামে মাঠ ছিল, মওলানা ভাসানীর কৃষক সম্মেলন হতো।

ম. দে. : ধান ভানতে মহিপালের গীত, প্রবাদ একটা।

আ. ই. : শিবের গীত না বলে মহিপালের গীত বলত। আমার মনে

হয়, মুফাত যে বলল কৈবর্ত বিদ্রোহ ছাড়াও অন্য যে বইগুলো, মধ্যযুগের যেসব বই পাচ্ছি, সেখান থেকে কিন্তু ইতিহাসটাও আসছে। সময়টাও বেশ চমৎকারভাবে চলে আসছে।

ম. দে. : সেটা তার মধ্যে প্রবেশ করে Recreate করে, এটা তো আমি চিরকালই করেছি।

আ. ই. : যেমন কবি প্রসঙ্গে আপনার বইতে দুটো জিনিস খুব ভালোভাবে এসেছে। যেমন একজন সন্ধ্যাকর নন্দী। যারা শাসকগোষ্ঠী, তাদের কিন্তু কবি চাই; কবি চাই, তাই না?

ম. দে. : এখনো চাই।

আ. ই. : আমার মনে হয় এখনো ওপরের শ্রেণির কবি চাই।

ম. দে. : হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে।

আ. ই. : হ্যাঁ আছে, না থাকলে চলে না। এখন ঐ আনন্দ নামে একজন কেরালার লেখক, মহাশ্বেতা দেবী তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তার একটা উপন্যাসের একটা অংশ, কেরালার লোকরা, মালয়ালাম ভাষায় লেখা, সেখানেও আছে যে কবি, রানি প্রত্যেকের চাই। রানি কিন্তু বদল হয়, বদল হতো আর কি, নতুন রাজা এলো, রানি থেকে গেল। মানে রানি হলো একটা Post-এর মতো। পদের মতো। ঐ থেকে গেল। আবার কবিও ঐ কবি রয়ে গেল। যে কবি আগের রাজাকে বন্দনা করেছে, সে আবার নতুন রাজাকে বন্দনা করছে। এই একজন সন্ধ্যাকর নন্দী। আরেকজন হলেন বন্দ্যঘটি। ওঁর সম্পর্কে আপনি কিছু বলুন আমাদের। তিনি কিন্তু Genuine কবি।

তখন ও বুঝতে পারল, এখানে তার কোনো জায়গা নেই। এই নগরীতে তার আর কোনো জায়গা নেই। প্রেমও তাকে আশ্রয় দিল না। সমাজব্যবস্থা দিল না। প্রেম দিল না। কেউ দিল না। সে অরণ্যের দিকে গেল।

ম. দে. : হ্যাঁ, কবি বন্দ্যঘটি, জীবন ও মৃত্যু লেখা হয়েছিল। ওঁর মতো মুকুন্দরাম চক্রবর্তী আমাকে খুবই Influence করেন। তাঁর ঐ যে 'কী করে আমি কবি হলাম' গ্রন্থের বিবরণে আছে।...এখনো দামিনা গ্রামে মুকুন্দর নামে মেলাটেলা হয় আর আমাকে ওরা খুব মানে, কারণ মুকুন্দরামকে নিয়ে আমি একটা উপন্যাস লিখেছিলাম।

আ. ই. : কবিকে নিয়ে উপন্যাস, হা হা।

ম. দে. : মুকুন্দরাম বারবার ফিরে ফিরে তো আসছে। ব্যাধ খণ্ডে ফিরে আসছে। কবি বন্দ্যঘটি নিয়ে সেইভাবে লিখেছিলাম যে আজকের দিনে একজন ডোম বা চণ্ডাল বা মেথর সমস্ত কর্ণাটকে, মহারাষ্ট্রে ওদের দলিত সাহিত্য আন্দোলন আছে। সে কবিতা লিখলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু তখন লেখাপড়া, বিদ্যাচর্চা একেবারেই একটা শ্রেণির হস্তগত ছিল। ও একটা বিরাট স্বপ্ন দেখেছিল, মানে ও জন্মগত যেটা ইয়ে, সেটাকে ত্যাগ করে, দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছিল। ব্রাহ্মণ যেমন উপবীত নেয়, তার দ্বিতীয় জন্ম হয়। মুক্তার দুটো জন্ম হয়। মুক্তা ঝিনুকের মধ্যে জন্মায়, আবার বেরিয়ে এসে মুক্তার ওপর...।

আ. ই. : তাই নাকি?

ম. দে. : Pearl has two births, প্রথমে as a moisture, তারপর Pearl. এ লোকটা নিজের একটা অর্জিত, আমরা প্রত্যেকে তা-ই করেছি। তবে অন্যান্য রকম বৃত্তি অবলম্বন করেছি। তার জন্য অশ্রদ্ধেয় হই না। এটা একেবারে আধুনিক যুগের, এটা আধুনিক মানসিকতার একটা ব্যাপার, তখনকার দিনে সেটা সম্ভব ছিল না। একটা শ্রেণিরই হস্তগত ছিল এইটে করা। এবং একজন অরণ্যচুয়াড়, যেখানে পরে চুয়াড় বিদ্রোহ হয়েছিল। অরণ্যচুয়াড় যে অরণ্যের পেছনে থাকত, সে এই কাজ করে। সে সেটাকে অস্বীকার করে, সে কবি হতে চেয়েছিল। যেহেতু সে সময়ের আগে জন্মেছিল, সেহেতু এই নগর তাকে বর্জন করল, মৃত্যুদণ্ড দিল। এবং অরণ্যে গিয়ে দেখে, সেখানেও সে তার পথ ভুলে গেছে। সে তার নিজের ইয়েতেও ফিরে যেতে পারছে না। এটা একটা Modern...

আ. ই. : হ্যাঁ, Problem টা আমার মনে হয়েছিল, যে এটা একটা আধুনিক সমস্যা। এখানেও থাকতে পারল না আর ওরা এসে পরে তাকে নিয়েই গেল আর কি জোর করে। এদিকে ওর প্রেমট্রেম হয়ে গেছে, বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে।

ম. দে. : হ্যাঁ, সে প্রেমিকা যখন বলল, 'তুই চুয়াড়', বলে মুখ ফিরিয়ে নিল। তার শরীরের মূল কৃমি, মানুষের শরীরে দুটো মূল কৃমি থাকে। মূল কৃমি তারা যেন মোচড় দিয়ে উঠল। তখন ও বুঝতে পারল, এখানে তার কোনো জায়গা নেই। এই নগরীতে তার আর কোনো জায়গা নেই। প্রেমও তাকে আশ্রয় দিল না। সমাজব্যবস্থা দিল না। প্রেম দিল না। কেউ দিল না। সে অরণ্যের দিকে গেল। and he was ultimately killed...

আ. ই. : এখন একটু গল্পের প্রসঙ্গে বলি, কেমন? আপনার মধ্যযুগের Background-এ যে গল্পগুলো আমাদের কাছে, আমার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় এই জন্য যে, একই সঙ্গে বাংলার ঐ সময়টাকে জানতে পারছি, আবার লোকজন সম্বন্ধেও জানতে পারছি। গল্পের পরিণতিটা একটু নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে...

ম. দে. : যা হবার তা-ই হচ্ছে।

আ. ই. : হ্যাঁ, যা হবার তা-ই হচ্ছে। আমার মনে হয় এই যে, নিষ্ঠুরতা এটা আমাদের যে একটা ভুল ধারণা আছে যে, বাংলায় একসময় খুব ভালো লোকটোক ছিল, খুব সুজলা-সুফলা ছিল, (ম. দে. : কোনো দিনই ছিল না।) সে কোনো দিনই ছিল না। চর্যাপদ থেকেই তো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাই না? সেই নিষ্ঠুরতা মাঝে মাঝে একটু ইয়ে করে, অস্বস্তি দেয়। এই অস্বস্তি দেওয়ার মধ্যেই আপনার সার্থকতা। কিন্তু এগুলো যদি নিষ্ঠুর না হতো তাহলে একটা তৃপ্তি তৃপ্তি ভাব নিয়ে...

ম. দে. : নিষ্ঠুর না ভেবে তুমি 'নির্মোহ'ভাবে ভাবো।

আ. ই. : না দিদি, 'নির্মোহ'র চেয়ে বেশি। নির্মোহ is a lesser word for this. (হাসি) এটাকে আমি ই করছি না, মানে আমি বলব, এটা আপনার Success. কারণ আমার মনে হয় লেখা Fiction উপন্যাস, এগুলো মানুষকে তৃপ্তি দেওয়ার জন্য লেখা না। মানুষকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলাই লেখার কাজ।

ম. দে. : (never never) আমার ভালো লেখাগুলো সম্পর্কে আমি কখনোই তা বলব না।

আ. ই. : মানুষকে তৃপ্তি দেওয়ার দরকার কী?

ম. দে. : অত আনন্দে রাখার কোনো দরকার নেই।

আ. ই. : (হাসি) অন্তত সুখে রাখার দরকার নেই, নাকি?

ম. দে. : একেবারেই না।

আ. ই. : হ্যাঁ, আমার মনে হয় এই যে কাঁটাগুলো আপনি বিঁধিয়ে দিয়েছেন, এটা ভালো।

ম. দে. : আমরা তো আলোচনা করে একমত হয়েছি। আমি তোমার 'চিলেকোঠার সেপাই' সেটাই স্মরণ করেছি। শব্দ তো সশস্ত্র। শব্দ তো আঘাত করে। শব্দ তো ভদ্রলোকের সব সভ্যতা ভেঙে দেয়। মৃত্যুর পরে হাড্ডিখিজির এসে বলছে না, 'থাকেন,

ঘরের মধ্যে বইয়া থাকেন আর মুত্তি মারেন বইয়া বইয়া।' এর মানে তো কিছুই না। Masturbation করার কথা বলা হয়েছে। এটাই তার Language. এভাবেই সে বলতে পারে। এগুলো করতে হবে তো। না করে তো হবে না।

ম. দে. : হ্যাঁ, আমার মনে হয় এগুলোই করা উচিত।

আ. ই. : মধ্যযুগ নিয়ে কি আপনার আরো গল্প লেখার ইচ্ছা আছে?

ম. দে. : মধ্যযুগ নিয়ে তো আমি বেশ কিছু লিখেছি।

আ. ই. : দিদি, মধ্যযুগ কথাটা বলতে খারাপ লাগে একটু।

ম. দে. : মধ্যযুগ না, তুমি (আ. ই. : দ্বাদশ শতাব্দী) বলতে পারো 11th century, 12th century এইভাবে। বেশ কিছু লিখেছি।

আ. ই. : তো আপনার মধ্যযুগের যে গল্পগুলোর Background-এর নাম, তার খাবারের যে বর্ণনা, অনেকটা 'মঙ্গল কাব্য' থেকে নেওয়া, না?

ম. দে. : যা পড়েছি তা থেকে নেওয়া।

আ. ই. : নামগুলো মিলে যাচ্ছে। ঐসব নাম এখন চলবে না।

ম. দে. : নাহ্।

আ. ই. : আপনি সাংঘাতিক খাবারের বর্ণনা দিয়েছেন। সেগুলো নিজে খেতে চান না আর কি!

ম. দে. : অনেক বর্ণনা দিয়েছি। Correct বর্ণনা।

আ. ই. : তার মধ্যে আধুনিক খাবার নিশ্চয়ই নেই, তাই না?

ম. দে. : সে যুগে তো আর এ যুগের খাবার চলবে না।

আ. ই. : তারপর মেয়েদের যে কষ্ট নিয়ে আজকাল খুব কথাবার্তা চলছে না? এই যে নারীবাদী ব্যাপার-ট্যাপার চলছে, মেয়েদের কষ্ট নিয়ে কিন্তু গল্প মহাশ্বেতা দেবী অনেক আগেই লিখেছেন..

ম. দে. : সমগ্র শ্রেণিটাই যদি দারিদ্র্যসীমার রেখার নিচে থাকে, একটা মেয়েকে আলাদা করে তুলে নিয়ে উন্নত করা কি করে যেতে পারে? তার স্বামীও তো সমান নির্যাতিত। তার পুত্রও নির্যাতিত। শুধু মেয়েটিকে কী করে আলাদা করা যাবে?

আ. ই. : এবার একটু অন্য প্রসঙ্গে। এটা গৌরাঙ্গ বলেছে ঠিকই, যেটা আপনার সঙ্গে আমাদের অনেক আলাপ হয়েছে, একটু বলি। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে বিহার কিংবা রাজস্থানের যে পটভূমিতে আপনি গল্প লিখেছেন, 'রুদালী'– এসব জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে কি ভাষার...

ম. দে. : 'রুদালী'টা একেবারেই পালামৌর Background-এ লেখা হয়, তাতে মোটামুটি আমি কখনোই আদিবাসী ভাষাও লিখিনি। কিন্তু আদিবাসী Mode of talking, সেটা এনেছি। যেভাবে তারা কথা বলে, বুঝতে পেরেছ? তুমি যখন পড়ছ তখন মনে হবে, তুমি ওদের ভাষায় কথা বলছ, 'রুদালী', 'নৈর্ঋতে মেঘ' এর মধ্যে আছে। পালামৌর Background-এ লেখা অন্তত 'নৈর্ঋতে মেঘ' এবং পরবর্তী অনেক বইয়ে আমি পালামৌকে রেখেছি ভারতের দর্পণ হিসেবে। সর্বত্র যা ঘটে তা-ই। এ Mirror দিয়ে দেখা যাবে সমস্ত ভারতবর্ষে এই ঘটনা। আর সিনেমা করার সময় কল্পনা লাজমী দেখতে ভালো লাগবে বলে রাজস্থানে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই।

আ. ই. : সিনেমা যে কী জিনিস...

মুফাদ: নাটকটা কেমন হয়েছিল?

গোপিনাথ মহান্তীর 'অমৃতের সন্তান' বা 'পরজা' আমরা কেউ পড়িনি। 'পরজা' ইংরেজিতে অনুবাদ আছে। পড়লে হাড় কেঁপে যাবে। তারপরে শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের 'চিংড়ি', ছবিও হয়েছিল। তারপরে শিবরাম কারান, নায়ার, বশির, রামানুজ, আনন্দ–অনেকের লেখা আমরা পড়িনি।

ম. দে. : নাটকটা অনেক Correct হয়েছিল।

আ. ই. : আচ্ছা, এবার আরেকটা প্রসঙ্গে আসি। আমরা বাংলাদেশে আর কি, ভারতে যে অন্যান্য, পশ্চিম বাংলার বাইরে যে সাহিত্যচর্চা চলছে, যেমন বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে, কেরালা, কর্ণাটকে, এসব সাহিত্য সম্পর্কে এখানে আমরা কিন্তু প্রায় অজ্ঞ, তাই না? তো পশ্চিম বাংলায় কিছু কিছু অনুবাদ হয়েছিল, এমনকি মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন। সেগুলোও তো মনে হয় না খুব একটা সাড়া তুলতে পেরেছে পশ্চিম বাংলায়।

ম. দে. : না না, পশ্চিম বাংলার লেখক সমাজ অন্যান্য রাজ্যের সাহিত্য সম্পর্কে, ভাষা সম্পর্কে খুবই কম খবর রাখেন বা রাখতে চান। কিন্তু পশ্চিম বাংলার বাইরে অন্যান্য ভাষায় মহান সাহিত্য সব লেখা হয়েছে, যার খবর আমরা কিছুই রাখি না, পড়ি না। গোপিনাথ মহান্তীর 'অমৃতের সন্তান' বা 'পরজা' আমরা কেউ পড়িনি। 'পরজা' ইংরেজিতে অনুবাদ আছে। পড়লে হাড় কেঁপে যাবে। তারপরে শিবশঙ্কর পিল্লাইয়ের 'চিংড়ি', ছবিও হয়েছিল। তারপরে শিবরাম কারান, নায়ার, বশির, রামানুজ, আনন্দ–অনেকের লেখা আমরা পড়িনি। কর্ণাটকের একটা সুবিধা হচ্ছে, দ্বাদশ শতকেই বাসোবা নামে একজন কবি বিদ্রোহ করেন, উনি ব্রাহ্মণ অর্থোডক্সির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এবং তখন থেকেই দলিত জাতি যাদের এখন বলা হচ্ছে, তারা লিখতে আরম্ভ করে।

আ. ই. : তাই? দ্বাদশ শতাব্দী থেকে?

ম. দে. : হ্যাঁ, দ্বাদশ শতাব্দী থেকে। ওখানে দলিত সাহিত্যের একটা বিশাল History আছে। সেটাই বাড়তে বাড়তে এসে এই সময়কালে পৌঁছেছে।

আ. ই. : দলিত সাহিত্য পশ্চিম বাংলাতেও বেশ বলা হচ্ছে আর কি।

ম. দে. : এখন বলা যা-ই হোক না কেন, সেগুলো সাহিত্য। এগুলো দলিতও বটে, সাহিত্যও বটে। আমি বলছি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একদম অন্য জাতির লেখা, সেটা কর্ণাটকে সবচেয়ে বেশি হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভাষাতেও তারা সকলেই যে লোয়ার কাস্ট তা নয়, কিন্তু খুব ধনী সাহিত্য আছে। চমৎকার সাহিত্য, যেমন–রাজস্থানে একটা লোক আছে বিজয়দং, সে সমস্ত রাজস্থানের ফোকলোর সংগ্রহ করে সে বিরাট ২০ খণ্ড বার করেছে। আর প্রতি সন্ধ্যায় সে গ্রামের লোকজন নিয়ে বসে, চারণ কবির মতো। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একটা হ্যাজাক নিয়ে বসে এবং তাতে সে শুধু রাজস্থানী গাথাটাথাই নয়, রাজস্থানের প্রতিটি গাথার নিজের ভার্সন আছে, সেগুলো খুব Interesting, যাদের বীর বলে চিত্রিত করা হয়, তাদের সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আবার সে লোকটা আমার অনুমতি নিয়ে...তারপরে দেখি রাজস্থান থেকে চিঠি আসছে, গ্রামের লোকেরা চিঠি লিখছে 'অরণ্যের অধিকার' নিয়ে, 'নৈর্ঋতে মেঘ' নিয়ে। তার মানে বিজয়দং ওটা...ওর ঐ সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানে এখনো আধুনিক সাহিত্য পড়া হয়। এবং সেসব জায়গায় অন্যান্য ভাষার সাহিত্য পৌঁছে গেছে। এটা একটা অসামান্য জিনিস।

আ. ই. : আচ্ছা, ওরা তো বাংলা সাহিত্য নিয়ে মোটামুটি খবরাখবর রাখে বলে মনে হয়।

ম. দে. : হ্যাঁ।

আ. ই. : আপনি যাদের নিয়ে এসেছিলেন এখানে। আনন্দ।

ম. দে. : হ্যাঁ, সেটা আছে।

আ. ই. : এরা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভালোই খবর রাখে বলে মনে হয়।

ম. দে. : হ্যাঁ।

আ. ই. : আপনি যাদের নিয়ে এসেছিলেন এখানে...এরা কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ভালোই খবর রাখে।

ম. দে. : প্রতিটি ভাষায় বাংলা গল্প-উপন্যাস অনুবাদ হয়, মালয়ালামে তো কথাই নেই, প্রাচীন দিন থেকে আজ পর্যন্ত। জসীমউদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কবেকার অনুবাদ, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'...(আ. ই. : তাই!) হ্যাঁ, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'। এগুলো বহুদিন থেকে অনুবাদ হয়ে আসছে। আমরা খবর রাখি না। সেই হিসেবে বাঙালি লেখকদের নাম, বিশেষ করে ঔপন্যাসিকদের নাম পরিচিত। অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ Practically হয়নি। তবে আমি ওদের কাছে বেশি পরিচিত বা প্রিয় এই জন্য যে আমি সব সময় নিজেকে ভারতীয় লেখক বলে মনে করি। আমি ভারতীয় লেখক। আমি বাংলায় লিখি এবং আমি সেভাবেই ওদের সঙ্গে মিশি, সেটা তো তুমি দেখলে। সব সময় এ দায়িত্বটা আমার ওপর এসে পড়ে।

> বাংলা উপন্যাসে এসে 'হুতোম পেঁচার নকশা' কিংবা 'আলালের ঘরের দুলাল'–এসবে কিন্তু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করলেন।

আ. ই. : না, পশ্চিম বাংলার এই ধরনের লেখকদের এক ধরনের উন্নাসিকতা আছে আর কি, যে আমাদের বাইরে কেউ নেই।

ম. দে. : ভীষণভাবে।

আ. ই. : যে আমরা আমাদের বাইরের কেউ নেই। আমাদের লেখকরাও তা-ই। আমরা Latin America-র খবর রাখি। না রাখলে তো একটা লজ্জার ব্যাপার, তাই না?

ম. দে. : এটা আমি অন্য প্রসঙ্গে খুব নির্মমভাবে লিখেছিলাম। যখন বর্তিকায় মুসলিম সমাজ ভাবনা, তার আগে বর্তিকায় আমি Serially মুসলিম Writer- দের গ্রামগঞ্জ থেকে ধরে ধরে কত লেখা ছেপেছি ঠিক নেই। আরে বাপ রে বাপ! যাই হোক হাফিজুর রহমান, ভাটায় এসে দর্জির দোকানদার পায়। তার জীবনই এমন বিচিত্র যে, সে কোনো দিন বলা যায় না। অসামান্য লেখা। আমি বলেছিলাম, গল্প-কবিতা চাই না। তুমি আকিকার বিষয় লেখো। তুমি সামাজিক বিষয়ে লেখো। বিবাহ প্রথা বিষয়ে লেখো। মুসলিম সমাজে এ সবই এসেছিল এবং এটা আমি দীর্ঘদিন থেকে বলে আসছি, ঘষামাজা করে আসছি যে, একজন ফরাসি যা ইংরেজদের বিয়ের সময় কী হয় না হয়, কী করে না করে, আমরা সব জানি। কিন্তু আমরা মুসলিম সমাজ সম্পর্কে কিছুই জানি না।

আ. ই. : না জানলে কী অবস্থা?

ম. দে. : আকিকাতে কী হয়? বিয়েতে কী হয়? ফরজ কাকে বলে, দেনমোহর কেন? এমনকি তাদের Inheritance Rule কী? এটা বর্তিকার মুসলিম সমাজ ভাবনাতে আছে। আমি বলেছিলাম, আগে তথ্যবাহী লেখাগুলো লিখবে, সমাজ পরিচিত। আর আমাদের দেশে মুসলিম যাঁরা লেখেন, তাঁরা কখনোই নিজ সমাজ নিয়ে লেখেন না।

আ. ই. : আপনাদের ওখানে আবুল বাশার তো আছেন।

মুফাদ: বাশারের লেখাতে Information, যেগুলো আমাদের সমাজ সম্পর্কিত, খুব ভালো।

আ. ই. : হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটাই বলতে চেয়েছিলাম।

ম. দে. : বাংলাদেশে যে রকম, মুর্শিদাবাদে সে রকম হবে না। কতগুলো জিনিস তো এক হবে। Inheritance Lawটা এক রকম হবে।

আ. ই. : না এটা ঠিক, উনি যেটা বলছেন যে, পশ্চিম বাংলার মুসলমান লেখক কেউ কেউ লিখছে, শুধু মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ সমস্যা নিয়ে। সে সমস্যাগুলো আছে, ঠিক অত প্রকট নয়। ওরা যেভাবে দেখাচ্ছে যে, এ ছাড়া যেমন তালাক ছাড়া, বাঙালি মুসলমানদের, তালাক ছাড়া আর কিছু করার নেই। (হাসি) এমনকি বিয়ে না করলেও চলবে, কিন্তু তালাক দিতে হবে!

ইকবাল: এরা সবাই একাধিক বিয়ে করে।

আ. ই. : না, বিয়ে না করলেও চলবে, কিন্তু তালাক দিতে হবে।

ম. দে. : আমি বলেছি, যার মধ্যে বসে আছ তাই নিয়ে লেখো। আরে তিতুমীরকে নিয়ে কেউ একটা উপন্যাস লিখল না আমার আগে!

মুফাদ : তিতুমীরকে নিয়ে কোনটা লেখা, দিদি?

ম. দে. : 'তিতুমীর' নামেই একটা উপন্যাস।

আ. ই. : মুস্তফা সিরাজ কিন্তু প্রথম দিকে মুসলমানদের নিয়ে লিখতেন না, তাই না? এখন লিখছেন যথেষ্ট। বেশ ভালো।

ম. দে. : Tragedyটা হচ্ছে, নতুন লেখক সেইভাবে Representative ভাবে উঠে আসছে না। আমাদের মধ্যে তরুণ কোনো মুসলিম লেখক থাকলে তার কাছে হিন্দু সমাজ নিয়ে...এখন হচ্ছে তো শিক্ষিত হিন্দু শিক্ষিত মুসলমান একসঙ্গে বিয়ে করছে, থাকছে, এই করছে, ঐ করছে; কাজেই They are not facing this problem. Problem গুলো কে খানিকটা কাছে...। আমি অনেক চেষ্টা করেছি শামসুল আলম সে ঐ বস্তিতেই থাকত। সে শেষ পর্যন্ত একটা খুব রাবীন্দ্রিক ভাষায় লিখল। একজন মুসলিম মহিলা লেখককে এত দিন ধরে Cultivate করলাম। Result হলো, তিনি একটা রান্নার বই লিখলেন। এই যে এই মেয়েটা তাহমিনা খাতুন, যে বিয়ে করল সুকুমার মিত্রকে, যাদের নিয়ে এত Problem হচ্ছে, থাকার জায়গা পাচ্ছে না। এত লড়াই করছে, এত বলেছি তোমার জীবনের কথা লেখো, না লেখেনি।

আ. ই. : নিজের জীবনী লিখতেও ভয় হয়।

ম. দে. : তার তো ভয়ের কিছু নেই। তার পেছনে সবাই দাঁড়িয়ে আছে, সবাই তাদের Support করছে।

আ. ই. : একেবারে আমি দেখলাম স্বপ্নময় নামের এক ছেলে এই মুসলিম Problem কিছু নিয়ে এসেছে। এই হিন্দু-মুসলমানের বিয়েটিয়ে এসব।

ম. দে. : আমি বলছি মুসলিম সমাজকে যথেষ্ট জানব, এটা কেউ লেখেনি। ড. সৈয়দ মুজতবা আলীর কিছু কিছু লেখায় পাই। অনেক আশা করে বাংলা একাডেমি থেকে কিছু মুসলিমের আত্মজীবনী নিয়েছিলাম। তখন দেখি তার মধ্যে কিছুই নেই। তারা কিভাবে পাক Pak Government-এ Join করল, এ ছাড়া আর কিছুই নেই।

আ. ই. : সরাসরি Politics আছে।

ম. দে. : আছে। কিন্তু সমাজচিত্র নেই।

আ. ই. : আবুল মনসুর আহমদ সেখানে Politics আছে কিন্তু Society নেই। এ দুটো তো অবিচ্ছেদ্যভাবে আসতে পারে।

ম. দে. : বেগম রোকেয়াকে নিয়ে বা সুফিয়া কামালকে নিয়ে কেউ

যদি উপন্যাস লিখত। কিছু তো হতো। ঐ জাহানারা সেদিন মারা গেলেন জাহানারা ইমাম, তাকে নিয়েও লেখা যেত। যথেষ্ট কাজ করা হয়নি।

আ. ই. : আমাদের দেশ তো এখন Unexplored, খালি পড়ে আছে। Virgin Land...

ম. দে. : না, পশ্চিমবঙ্গেও যথেষ্ট কাজ করা হয়নি। আমি খানিকটা কাজ করেছি, তাই তোমরা আমাকে নিয়ে এত জ্বালাতন করছ!

আ. ই. : (হাসি) কাজ করলে তো জ্বালাতন সহ্য করতেই হয়, তাই না?...হ্যাঁ, আবু জাফর শামসুদ্দীনের লেখায় Society কিছু আছে।

ম. দে. : Society কিছু থাকার কথা বলছি না। মুসলমান সমাজ ও জীবন নিয়ে সেই উপন্যাস...বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের মধ্যে তো তখনকার গ্রামজীবন প্রচুর উঠে আসে। গরিবের কী অবস্থা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইকবাল: আব্দুল ওদুদের লেখাতে কিছু কিছু আছে।

আ. ই. : কিন্তু সেটা আর্ট হয়নি। একটা কাজ শিল্প তো হতে হবে, তাই না।

ম. দে. : শিল্প তো হতে হবে, তাই না?

আ. ই. : হ্যাঁ, শিল্প তো হতে হবে, তারপরে তো, তা ছাড়া হবে কী করে?

মুফাদ : 'লালসালু'...

আ. ই. : হ্যাঁ, 'লালসালু' প্রথম...কিন্তু শিল্প হলো বলেই তো হলো।...একটা জিনিস দিদি, সেটা বলি, মানে বাংলা উপন্যাস সম্পর্কে। উপন্যাস যখন শুরু হয়, মানে ইউরোপে আর কি, পুঁজিবাদের বিকাশের পর, কিন্তু প্রথম থেকেই বুর্জোয়া Society কে Attack করে আসছে, তাই না? সব সময়। বুর্জোয়া বা ফিউডাল সব, ডন কুইকজট থেকে কিন্তু হয়েছে...নানা গল্পে, সেখানে কিন্তু সোসাইটির ওপরের অংশকে আক্রমণ করা হয়েছে। এমনকি 'Arabian Night', 'আরব্য উপন্যাস'গুলোতেও হচ্ছে। বাংলা উপন্যাসে এসে 'হুতোম পেঁচার নকশা' কিংবা 'আলালের ঘরের দুলাল'–এসবে কিন্তু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এগুলোকে সমূলে উৎপাটন করলেন। উৎপাটিত করলেন না? যেখানে অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য ভাষার উপন্যাসে দেখছি যে প্রচলিত সংস্কারগুলোকে আক্রমণ করা হচ্ছে, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত কুসংস্কারকে মূল্যবোধ বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাই না? কারণ এই যে দেবী চৌধুরানীর মতো চমৎকার মেয়ে, যে বাইরে এল, তাকে শেষ পর্যন্ত হারামজাদা স্বামীর পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তৃপ্তি পেলেন। তাই না ব্যাপারটা? এ কারণে আমি বলছি, এটা সাজানো উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র যে কাজটা করে গিয়েছিলেন, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেটাই ফলো করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শুধুমাত্র ছিমছাম গল্পের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। আমি কোনো রকম বিভাজন করছি না। কোনো রকমই না। মুসলমানরা যখন উপন্যাস লিখতে শুরু করল, সেটা আর্ট হলো না, কিন্তু তা পিরবাদের বিরুদ্ধে গেল, যেমন 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাস। 'আব্দুল্লাহ' মোটেই ভালো উপন্যাস নয়, কিন্তু উপন্যাসে...

ম. দে. : তুমি 'বিষাদ সিন্ধু' পড়ো। এটা একটি Pure writing. যেসব কথা লেখা আছে, অসাধারণ একটা অসামান্য উপন্যাস। সেগুলো এখন আমরা লিখতে পারতাম না। এখন লিখলে তো মুরতাদ হতো...'জমিদার দর্পণ' দেখো...

আ. ই. : আমার মনে হয় বাংলাদেশের যে সোসাইটি আছে, হিন্দু-মুসলমান সব নিয়ে যে সমাজ আছে, সেটা উঠে আসবে। সেটা উঠে আসবে, তবে সময় লাগবে। মনে হয় সেটা ভালোই হবে।...

(মহাশ্বেতা দেবীর গান: 'আমার কান্তে জনম গেল রে, আমার ভাবতে জনম গেল রে; আমি কেন তারে মন রে দিলাম...)

এর পরের পর্ব আর অনুষ্ঠিত হয়নি।

(বাঙলাদেশ লেখক শিবিরের সাহিত্য পত্রিকা, আনু মুহাম্মদ সম্পাদিত *তৃণমূল* ৪র্থ সংখ্যা (মার্চ ২০০১) থেকে পুনর্মুদ্রিত। এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।)